রঞ্জন-এর শীতে উপেক্ষিতা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই কবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কাব্যে উপেক্ষিতাদের নিয়ে এক চমৎকার নিবন্ধ। সেই শোকগাথা যতবার পড়েছি, প্রতি বারই ভেবেছি সেই অসহায়া নারীদের কথা, মনে এই ভাবনার উদয় হয়েছে তাঁদের স্রষ্টারা কা নিদারুণ নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর, না কি অন্য প্রধান চরিত্রদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অসহায়াদের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন স্রষ্টা!

বহুকাল পরে আর-এক বাঙালি লেখক লিখলেন অন্য এক উপেক্ষিতাকে নিয়ে, তার উপেক্ষা অবশ্য কেবলমাত্র শীতকালেই। বছরের বাকি ঋতুতে তার প্রভূত দেমাক।

সেই দেমাকীকে কেউ যদি শীতঋতুতে দেখতে চান, তা হলে কোথায় থাকে তার গুমর! রঞ্জন নামে এক লেখক গিয়েছিলেন তার কাছে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে, এক পক্ষকাল তার কাছে কাটিয়ে, কলকাতায় ফিরে এসে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর অনুভূতি। সন-তারিখের হিসেব যদি করি, গিয়েছিলেন স্বাধীনতার ঠিক অব্যবহিত পরে, লিখলেন ধারাবাহিক-ভাবে তার পরের বছর 'মাসিক বসুমতী'তে, বই হিসেবে বেরোল তার পরের বছর, সেটা তেরোশো ছাপ্পান্ন সাল।

এই বই প্রথম যখন পড়েছিলাম, ষাটের দশকের মাঝামাঝি, তখন কলেজে পড়ি, যা হাতে পাই, তাই পড়ি, সেই প্রথম পাঠের স্মৃতি যেটুকু মনে আছে তা একটি ভ্রমণকাহিনির। এত বছর পরে যখন দ্বিতীয় পাঠে মন দিয়েছি, প্রতিটি পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছি, আর ভাবছি অল্পবয়সের পাঠ কী প্রতারণাই না করেছিল আমাকে। ভ্রমণকাহিনি তো একেবারেই নয়, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এক অসাধারণ উপলব্ধি যা পাঠককে আপ্লুত করবে, অভিভূত করবে, সম্মোহিত করে রাখবে যতক্ষণ না পৌঁছোতে পারবে শেষ বাক্যটিতে। আরও একটু এগিয়ে বলা যায়, দ্বিতীয় পাঠের জের হয়তো থাকবে বাকি জীবন।

বইটি হাতে নেওয়ার সময় 'কে সেই ব্যক্তি যিনি শীতে উপেক্ষিতা' এ নিয়ে হয়তো জেরবার হতে পারেন পাঠক, কিন্তু পৃষ্ঠা ওল্টাতেই সব সন্দেহের নিরসন। তিনি ব্যক্তি নন, স্থান। বাঙালির চিরপরিচিত চির-ভালোবাসার ট্যুরিস্ট স্পট। বাংলার উত্তরে দার্জিলিং নামে যে মন-পাগল-করা শৈলশহরটি আছে তাতে সারা বছর ভরে থাকে মানুষজনে। কিন্তু 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'র মতো 'কে হায় শীতের দেশে শীতকালে যায়!' শীতের দার্জিলিং এক জবুথবু হদ্দ বুড়ির মতো কাঁপতে থাকে ঠকঠক করে, লেপকাঁথা মুড়ি দিয়ে দিনের বেশিটা সময় ঘুমিয়ে কাটায়। যাঁদের সুযোগ আছে, লোটাকম্বল হাতে নিয়ে সেখান থেকে বরং সমতলে নেমে আসেন তাঁরা। সেসময় লম্বা ছুটি দিয়ে দেন অনেক স্কুলের কর্মকর্তারা। বহু ছাত্রছাত্রী ফিরে আসে সমতলের বাড়িতে।

শীতে উপেক্ষিত সেই শৈলশহরে হঠাৎ একদিন পা রাখলেন এক অক্ষরকর্মী। কিন্তু তিনি কেন এলেন সে-বিষয়ে একটা কৈফিয়ৎও দিয়েছেন ট্রেনে তাঁর সঙ্গীসাথীদের অজস্র প্রশ্নের

জবাবে। একজন তো গলার স্বর ক্ষীণ করে বললেন, 'উঁহু, এই শীতে যখন বেড়াতে দার্জিলিং যাচ্ছে তখন আমার কী মনে হয় জানেন,'...'আমার মনে হয় মাথার একটু দোষ আছে।'

'মাথার দোষ' নিয়ে শীতের প্রখর প্রহরে দার্জিলিং না গেলে কি সৃষ্টি হতে পারত এ রকম একটি উপলব্ধি-গ্রন্থ! সাহিত্যের নিয়ম এই যে, ধরাবাঁধা জীবনের বাইরে গিয়েই তুলে আনা যায় অন্যতর অনুভূতি, ভিন্নতর বোধ। যে-পথ দিয়ে সবাই হাঁটে, সে-পথ দিয়ে হেঁটে খুব কম ক্ষেত্রেই জন্ম হয়েছে ক্লাসিকের। তাই তো রঞ্জনের দার্জিলিং যাওয়া!

অবশ্য বইয়ের শেষে আমরা জেনেছি লেখকের দার্জিলিং যাওয়ার কারণ আরও গভীরতর। সে কথা ক্রমশ প্রকাশ্য।

যাওয়ার কৈফিয়ৎটুকু আগাম দিয়ে রাখলে পাঠক অতঃপর আবিষ্কার করবেন এক অন্য দার্জিলিংকে। সেই যাওয়া এমন এক সময়ে যখন এখনকার মতো রামট্যুরিস্ট ছিল না বাঙালি। এখন বাঙালি ঘোর শীতে পছন্দ করে দার্জিলিং যাওয়া, ঘোর গ্রীষ্মে জয়সলমিরের মরুভূমিতে, ঘোর বর্ষায় চেরাপুঞ্জিতে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের সমসময়ে দার্জিলিং যাওয়া মানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে যাওয়া।

কিন্তু সেখানে গিয়ে কী পেলেন লেখক! তা জানতে গেলে বুঝতে গেলে ওল্টাতে হবে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি। মনোনিবেশ করতে হবে প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি অক্ষরে। একটি বাক্যও 'স্কিপ' করা যাবে না—এ বই এমনই ঠাসবুনোটি লেখা। মোট বারোটি পরিচ্ছেদ, তার প্রতিটি পরিচ্ছেদে কখনও একটি ঘটনা, কখনও শুধুই উপলব্ধি, কখনও শুধুই বর্ণনা। যখন বর্ণিত হয়েছে ঘটনা, তখন তা একটি নিটোল ছোটোগল্প, যখন উপলব্ধি তা এক অশ্রুতপূর্ব দর্শন, যখন বর্ণনা তা অজস্র চিত্রকল্প সমন্বয়ে একটি চমৎকার কবিতা।

তবে পাঠক যদি ঝরঝর করে পড়ে যেতে চান এই বই, তিনি নিরাশ হবেন। এই বইয়ের সম্পদ তার ভাষা, যা লেখক গ্রন্থিত করেছেন বহু আয়াসে। অথবা এও হতে পারে তা অনায়াস-লব্ধ, শুধু তার সঙ্গে পরিচিত হতে কিছু সময় ব্যয় করতে হবে পাঠককে। তবে গ্রন্থের ভাষার সঙ্গে একবার পরিচয় হয়ে গেলে তখন পাঠকের মগজে পৌঁছোবে তার প্রকৃত রসাস্বাদন।

লেখা শুরুর আগে বরং পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই লেখকের সুখ্যাত গদ্যভাষার সঙ্গে, 'শুধু ম্যাল নয়, ম্যালের উচ্চতা থেকে যেদিকে তাকাই কুয়াশা আর কুয়াশা। ভারী একটা দুশ্চিন্তা জগদ্দল পাথরের মতো, ডস্টয়ইয়েভস্কির গদ্যের মতো, গভীর একটা শোকের মতো, কুয়াশা যেন তার অন্তহীন আয়তন নিয়ে চেপে আছে গোটা দার্জিলিঙের বুকের উপর।'

এই তো গেল বইয়ের সঙ্গে পাঠকের পরিচয়পর্ব। কিন্তু আরম্ভেরও একটা আরম্ভ থাকে। লেখক এই বই উৎসর্গ করেছেন আর এক ছদ্মনামী লেখক যাযাবরকে, উৎসর্গপৃষ্ঠায় এও বলেছেন : এই বই যখন প্রকাশিত হচ্ছিল ধারাবাহিকভাবে, অনেকেই সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এটি যাযাবরের লেখা কি না!' জিজ্ঞাসা করার একটাই কারণ আমরা উপলব্ধি করি তা হল, যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'ও লেখকের উপলব্ধি-সঞ্জাত এক আশ্চর্য গদ্যলিখন, রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'ও সেই একই ধাঁচের বই। দ্বিতীয় আর-একটি যে মিল আমার চোখে ধরা পড়ল, 'দৃষ্টিপাত'-এ যেমন ছিল, 'শীতে উপেক্ষিতা'-র গদ্যলিখনেও উপলব্ধির মধ্যে উঁকি দিয়ে গেছে কিছু অসাধারণ ছোটোগল্প।

কোথাও উল্লেখ না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না রঞ্জন এই গ্রন্থলিখনের প্রাক্কালে মগজের মধ্যে ভরে নিয়েছিলেন 'দৃষ্টিপাত'-এর দৃষ্টান্ত। তাঁর জ্ঞাতসারে, কিংবা হয়তো অজ্ঞাতসারেই, তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন 'দৃষ্টিপাত' এর গদ্যভঙ্গিতে।

কিন্তু সেই প্রভাব আপাতত উপেক্ষা করা যাক, নইলে 'শীতে উপেক্ষিতা'র অসাধারণ গদ্যকথন মাঠে মারা যাবে। রঞ্জন নিতান্ত খামখেয়ালির মতো কোনও এক শীতের সকালে অবতরণ করলেন শিলিগুড়ি স্টেশনে (শিলিগুড়ি! না নিউ জলপাইগুড়ি! না কি স্বাধীনতোত্তর সময়কালে নিউ জলপাইগুড়ির নাম ছিল শিলিগুড়ি! পরে পরিবর্তিত হয়েছে নাম!)।

লেখক শুধু অবতরণ করার মধ্যে পার করেছেন প্রায় এক-ফর্মা পৃষ্ঠা, তার মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ শুধু ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন ও তাঁর স্বগতোক্তি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্টেশনে পৌঁছোন, সেখানেও ব্যয় করেছেন আধ-ফর্মা, অবশেষে স্টেশনে নেমে, 'শীতের শিলিগুড়ির জনবিরল স্টেশনে নেমেই দূরে তাকিয়ে দেখলাম, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা উজ্জ্বল হয়ে আছে নবোদিত সূর্যের স্বর্ণাভ কিরণমহিমায়। একবারও মনে হল না যে, চিরপরিচিত কলকাতাকে ফেলে এসেছি পশ্চাতে। মনে হল যেন বহুদিনের বিদেশবাসের পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছি।' ঠিক তার পরের অনুচ্ছেদে, 'হিমালয়, তোমাকে নমস্কার করি। তোমার ওই অভ্রভেদী তুষারকিরীট গিরিশৃঙ্গের শীর্ষ স্পর্শ করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে বহুদূরাগত শত সহস্র উদ্ধত পর্যটক। আমি তে তোমাকে জয় করতে আসিনি, এসেছি পরাজয় স্বীকার করতে।'

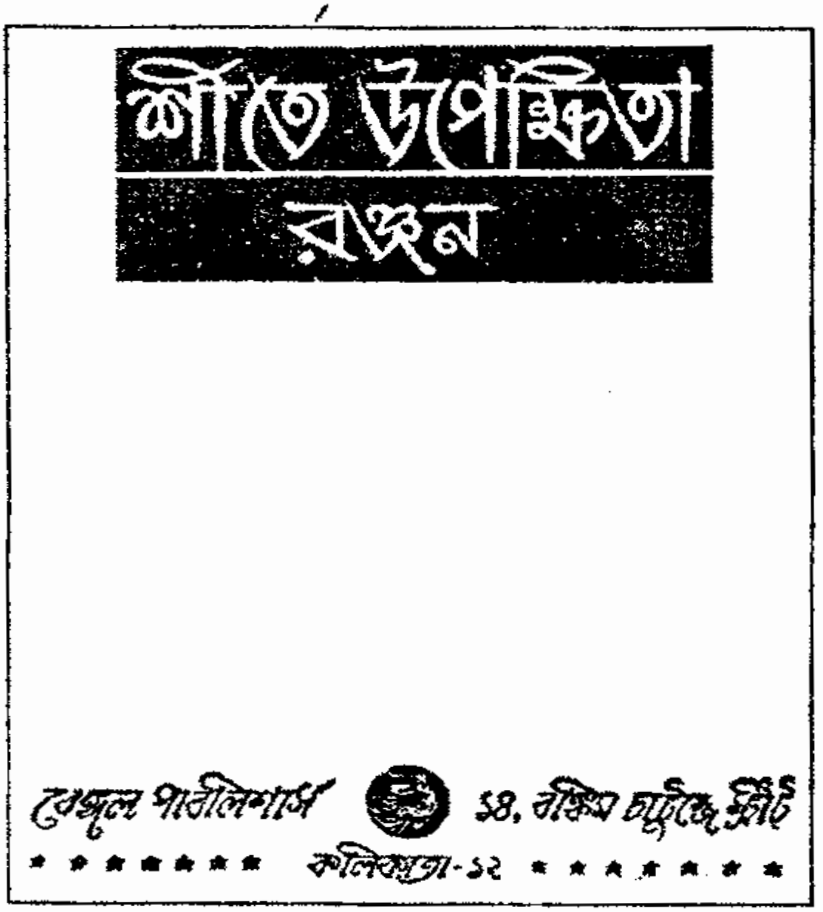

শীতে উপেক্ষিতা-র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

এভাবেই ক্রমে শুরু হয় লেখকের দার্জিলিং না-জয়ের কাহিনি, সেখানে অলৌকিকভাবে দেখা হয়ে যায় তাঁর একদা-প্রেমিকার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙক্তি ব্যবহার করে শুরু হয় দুজনের কথোপকথন, বিবাহিত-জীবন পৌঁছে যে-মেয়ে অবলীলায় বলে, সে আসলে কোনও দিনই ভালোবাসেনি, ভালো ব্যবহার করত এইমাত্র। 'ভালো ব্যবহার'কে যদি ভালোবাসা ভেবে ভুল করে থাকেন লেখক, সে অনন্যোপায়। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর লেখকের উপলব্ধি, 'অনেক মধুর ভুল আছে যা না ভাঙাই ভালো।'

কিংবা হঠাৎ দেখা যায় এক ইংরেজ অতিবৃদ্ধ আর্থার কলিনের সঙ্গে, সেই দেখা-হওয়াও যেন এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা। সেই দেখা হওয়ার প্রথম মুহূর্ত, 'কুজ্ঝটিজন্তুর এ যেন বিদ্রুপগর্ভ দন্তবিকাশ। ভীত বিস্ময়ে সমস্ত চেতনা আমার শিহরিত হয়ে উঠল।' সেই অশীতিপর কিংবা

নবতিপর বৃদ্ধ গাঢ় শীতের ভোরে ওভারকোটে মুড়িঝুড়ি দিয়ে এসে বসলেন লেখকের পাশে। সেই বৃদ্ধের ঠোঁটে সিগারেট ধরানোর প্রক্রিয়াও এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া ও তার অব্যবহিত পরের অভিজ্ঞতা আরও সাংঘাতিক। যাই হোক, আলাপের প্রাথমিক ভীতি দূর হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আলাপ ও পরবর্তী অভিজ্ঞতা পড়তে গিয়ে মনে হয়—পড়ছি একটি বিদেশি ছোটোগল্প, যার পরিণতিও হয়ে ওঠে ভয়ংকর।

দার্জিলিং-এর ভারতভুক্তির ইতিহাসও লেখক বিবৃত করেছেন নিখুঁত পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। নেপাল-সিকিম বিরোধ মেটাতে গিয়ে ইংরেজ সরকার কীভাবে সিকিমের রাজার কাছ থেকে দার্জিলিং নিয়েছিলেন উপঢৌকন হিসেবে তা লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন এক সরকারি পরিদর্শকের মন্তব্য, 'দার্জিলিঙের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার সবটুকুর জন্য সকল কৃতিত্ব ডক্টর ক্যাম্পবেলের প্রাপ্য। দুরধিগম্য অরণ্যভূমিকে তিনি পরিণত করেছেন অপরূপ শৈলাবাসে; আবাসের অযোগ্য পার্বত্য উপত্যকা থেকে সৃষ্টি করেছেন অনুপম ভূস্বর্গ।'

অতএব দার্জিলিং-এর অধিকার নিয়ে পাহাড়ের মানুষদের কিছু বলার থাকতে পারে না, কেন-না নিরস পাথর কেটে তাকে ভাস্কর্য হিসেবে দাঁড় করেছিলেন ইংরেজরা, কোনও পাহাড়ি মানুষ নয়।

অতঃপর লেখকের একদিন অশ্বারোহণের অভিজ্ঞতাও সম্পন্ন হল, সেই বর্ণনাও এক অসাধারণ কাব্যিক অনুভূতি, কিন্তু সেদিনই তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা তাঁর প্রথম প্রেমিকা শিখার। আর দীর্ঘকাল পরে দুই নারী-পুরুষের না-বলা কথাগুলি বিস্ফোরণ ঘটাল তীব্র বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে। তখন এও মনে হয় কী প্রয়োজন ছিল সেই সাক্ষাতের। যে-প্রেম ঘুমিয়েছিল দীর্ঘসময়, তাকে ঘুমোতে দিলেই তো ভালো ছিল, তার মধ্যেই ছিল তার মাধুর্য, তাকে সুপ্তি থেকে বার করে কচলে তিতো করে দিয়েই তো মৃত্যু ঘটানো হল এক স্বর্গীয় প্রেমানুভূতির।

অথবা এমনটা ঘটিয়ে প্রেমকে নতুনভাবে চিনতে শিখলেন লেখক।

তবে সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদেই এই বইয়ের ক্লাইমাক্স। জনৈক মিসেস রায়ের লজ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা কর্নার'-এ বাস করতে গিয়ে লেখক মুখোমুখি হলেন এক অভাবনীয় প্রেমের ঘটনায়। তাঁর থাকাকালীন দিনগুলিতেই মিস্টার রায়ের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেল মিসেস রায়ের। তারপর মিসেস রায়ের মুখ থেকে যে-কাহিনি শুনলেন তো কোনও ক্লাসিক উপন্যাসের কাহিনিকেও হার মানায়। পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছিল রঞ্জন একজন পরিব্রাজকমাত্র, নিজের উপলব্ধির কথা লিখতে পারেন অনন্য বাক্যবিন্যাসে কিছু গদ্যলেখা, তিনি উপন্যাসের লেখক নন, তা না হলে এরকম একটি প্লট নিয়ে অনায়াসে লেখা যেত এক ধ্রুপদি উপন্যাস।

আবার কোনও একটি পরিচ্ছেদ এক কাল্পনিক চরিত্রের সঙ্গে দীর্ঘ সংলাপ। তাঁর সঙ্গে আলাপ এক অদ্ভুত পরিবেশে, এক নির্জন শুনসান রেস্টুরেন্টে, তাঁর উপস্থিতি এরকম সজ্জায়, 'সারা গায়ে গরম জামা, মাথায় এবং গলায় মোটা মাফলার, হাতে দস্তানা; শুধু রক্তবর্ণ চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।' নিজের সঙ্গে দেখা অনেকেরই হয়ে থাকে, নিজের সঙ্গে কথোপকথন আমরা অনেক সময়ই করে থাকি, কিন্তু সেই সংলাপ যখন উপস্থিত হয় একটি ছোটোগল্পের আকারে, তখন লেখককে দেখতেই হয় এক অন্য চোখে।

কখনও গল্প, কখনও উপন্যাস, আবার কখনও অলৌকিকতাও এসে যায় তাঁর লিখনে। লেখকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এক বৃদ্ধ নেপালি ভদ্রলোকের। তাঁর কাছ থেকে শুনলেন মারপা-মিলারেপার এক অলৌকিক কাহিনি। সেই কাহিনিতে নেপালিদের অগাধ বিশ্বাস শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন লেখক। কিন্তু ভেবেছিলেন, 'অবৌদ্ধ অবিশ্বাসীর কাছে এ কাহিনি মনোরম উপকথা মাত্র। কিন্তু, বিশ্বাসী বৌদ্ধ আজও এ কাহিনি ভক্তিনত চিত্তে স্মরণ করে হৃদয়ে সেই অপরিসীম প্রশান্তির স্পর্শ অনুভব করে, যা তার জীবনকে করে তোলে ছন্দময়, যা তার গতিকে দেয় স্থির লক্ষ্য আর প্রাণকে দেয় অবিচল আনন্দ।'

আবার ঘুমের মনাস্টেরি দেখে ফিরে এসে খুঁজে বার করেন সেই বৃদ্ধকে, তাঁর কাছ থেকে খুঁটিয়ে জেনে নেন লামাদের জীবনযাপন ও জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে। সেই দীর্ঘ কথোপকথন তো এখানে বিবৃত করা যাবে না, কিন্তু পড়তে গিয়ে আমি ভাবছিলাম রঞ্জনের দার্জিলিং ভ্রমণ আর ভ্রমণ থাকে না, হয়ে ওঠে এক অসাধারণ জীবনদর্শন।

লেখকের দার্জিলিং থাকাকালীন সময়ে মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছিলেন আততায়ীর গুলিতে। সেই ঘটনা কাঁপিয়ে দিয়েছিল সারা ভারতকে। লেখকও হয়েছিলেন শোকতপ্ত। শোকের দিনগুলির কথা লিখতে গিয়ে লেখক প্রকাশ করেছেন তাঁর অনুভূতি :

'সব ঠিক। কিন্তু, কী যেন নেই। দূরে ওই হিমালয় ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। আমার সামনে চেয়ারটা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। এতটুকু নড়েনি। উপরে সূর্য কিরণ বিকিরণ করছে। সব ঠিক আছে।

কিন্তু কী যেন নেই।

আমার ডান হাতে ঠিক পাঁচটা আঙুলই আছে। বাঁ হাতেও তাই।...কিন্তু তবু কী যেন নেই। কোথা থেকে কী যেন চলে গিয়েছে।'

এই শোকবহ পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎই কলকাতা থেকে একটা খাম এসে পৌঁছোয় লেখকের হাতে। সেই খামের উপর যার হস্তাক্ষর তা তাঁর খুব পরিচিত একজনের। সেই হস্তলিপি যার, তার উপর অভিমান করেই তো তাঁর দার্জিলিং পালিয়ে আসা এই ঘোর শীতের ঋতুতে। অনেকক্ষণ পরে শঙ্কিত হৃদয়ে একসময় খুলেই ফেললেন সেই চিঠি, আর কী আশ্চর্য, তাতে সে ফিরে যেতেই লিখেছে। তারপর, 'আর কিছু চাইনে। কিছু না। খ্যাতি চাইনে, বিত্ত চাইনে, জন্মচক্র থেকে মুক্তি চাইনে, মোক্ষ চাইনে—শুধু যদি তোমার কাছে যাবার নিমন্ত্রণ পাই, অনুমতি পাই তোমার কাছে থাকবার। শুধু যদি এই কথাটি জানতে পাই যে আমার সকল ত্রুটি, সকল অক্ষমতার ক্ষমা আছে তোমার কাছে। শুধু যদি জানি যে তোমার হৃদয় থেকে আমার ঘটেনি চিরনির্বাসন।'

এই কয়েকটি লাইনে লেখক লিখে ফেললেন আর-এক অ-কথিত উপন্যাসের কয়েকটি মন কাঁদিয়ে দেওয়া পঙক্তি।

অতএব ফিরে যাওয়ার সময় হয় লেখকের। দার্জিলিঙের সঙ্গে তার সঙ্গে মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়, কিন্তু প্রবাসের দিনে সেই পরিচয় কখন যেন রূপান্তরিত হয় আত্মীয়তায়, তাই কাজের ছেলেটি মোহন কেঁদে ভাসায়, সেই কান্না যেন গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে একাকার হয়ে লেখককে বিষণ্ণ করে। ফেরার মুহূর্তে মনে পড়ে আরও বহুজনের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া উচিত।

পনেরো দিনের এই স্মৃতি লেখককে নিঃসন্দেহে উন্নীত করেছে এক অন্য পৃথিবীতে। ভ্রমণ সর্বদাই মানুষকে সমৃদ্ধ করে, কিন্তু সমৃদ্ধতর করে যদি থাকে দেখার চোখ, বোঝার মন, অনুভব করার মতো হৃদয়। বইয়ের শেষে 'লেখকের কথা' শীর্ষক রচনাটিও খুব কৌতূহল-উদ্রেককারী। কেন তাঁর ছদ্মনাম গ্রহণ তা ব্যক্ত করেছেন প্রাঞ্জলভাবে। আসলে সব লেখকই তাঁর লেখার মান নিয়ে সন্দিহান থাকেন। সকলেই ভালো বলছে, কিন্তু একজনও যদি বলে, 'লেখাটা কিচ্ছু হয়নি', তা হলে দীর্ঘ পরিশ্রম করে একটি-একটি করে শব্দচয়ন করে লিখিত গ্রন্থটির সৃষ্টি বৃথা মনে হবে লেখকের। তাই অন্তরালে থাকাই শ্রেয়। 'কে রঞ্জন! তার লেখা বুঝি ভালো হয়নি!' বলে এড়িয়ে থাকা যায় দিব্যি।

পাঠক হিসেবে বইটির শেষ পঙক্তি পর্যন্ত আমি পড়েছি নিবিড়ভাবে, ঋদ্ধ হয়েছি এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পনেরো দিনের ব্যাপ্তি যেন এক অনন্ত সময়, সেই সময়কালে অনেকগুলি কাহিনি উপস্থাপিত করে তার পরিণতি টানতে চেয়েছেন লেখক। লেখকের অভিজ্ঞতা, তাঁর অনুভূতির প্রকাশ, তাঁর নিজেরই ঋদ্ধ হয়ে ওঠা, তারই ফলশ্রুতিতে পাঠকেরও সমৃদ্ধি।

কিন্তু লেখক হিসেবে যখন মূল্যায়ন করতে চাইলাম, প্রথমেই মনে হল এই বইয়ের লিখনের সঙ্গে, উপস্থাপনার সঙ্গে 'দৃষ্টিপাত'-এর কেন এত মিল! লেখক বইটি যাযাবরকে উৎসর্গ করায় সেই প্রভাব আরও স্পষ্ট হয় পাঠকের কাছে। কিন্তু পরে এও মনে হল যাযাবর একটি পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথের পথিক তো আরও অনেকেই হতে পারে। বরং সাহিত্যের এও আর-একটি শাখা, যা ভবিষ্যতের কোনও কোনও লেখক অনুসরণ করলে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা-ভ্রমণকাহিনির বাইরে সৃষ্টি হবে একটি নতুন সাহিত্যপথ।